Kothopokathan by Purnendu Patri

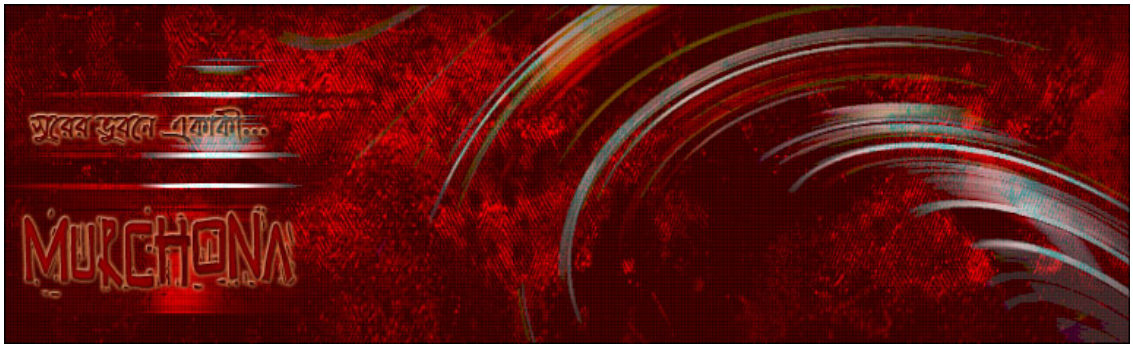

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

কথোপকথন / দুই

পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়ার সময় এ বইয়ের প্রায় সব কবিতারই শিরোনাম ছিল, 'অমিতাভর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা'। বেশি বাস্তব-ঘেঁষা এই নামকরণ বিব্রত হওয়ার কারণ ঘটিয়েছে বহুবার, প্রিয় পাঠকপাঠিকাদের আচমকা প্রশ্নে। প্রশ্ন একটাই, কে এই অমিতাভ? যে কোনো একটি জ্যান্ত অমিতাভ-র সংবাদ পেতে তারা ব্যগ্র। উত্তরের বদলে আমার মুখে মোনালিসা-মার্কা হাসির পেখম ছড়াতে দেখে অতঃপর তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছেন রহস্যোদ্ধারে। যে পাঠক কবিতার ভক্ত, তার উত্তর—নিশ্চয়ই অমিতাভ দাশগুপ্ত? যে পাঠক সিরিয়াস সিনেমার অনুরাগী—আসানসোলের সিনেমা-সমালোচক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় নাকি? যাঁদের হাঁটা-চলা আঁকা-ছবির জগতে—শিল্পী অমিতাভ ব্যানার্জী?
শান্তিনিকেতনের অমিতদা, খবরের কাগজের অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনেকদিনের। তাই কারো কারো চোখের আঙুল ঘুরেছে সে দিকেও। তবে সবচেয়ে সাংঘাতিক আবিষ্কার ছিল জনৈক বন্ধু-পত্নীর। কদিন আগে 'দেশ'-এ বেরিয়েছে একটা কবিতা। অমিতাভ বচ্চনের অসুখ নিয়ে খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই ভাজা হচ্ছে মুখরোচক তেলেভাজা। মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু-পত্নীটির প্রশ্ন, তোমার কবিতাটা কি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে লেখা? কবিতাগুলো বই হয়ে বেরোলে বাড়তে পারে আরো বিড়ম্বনা, সে আশঙ্কাতেই এই নতুন নামকরণ। এ বইয়ে আমার কথোপকথন একাধিক বন্ধুর সঙ্গে, অমিতাভ যাদের প্রতীক। অবশ্য বেশ কয়েকটা কবিতার অমিতাভ, কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত।
এ বইয়ের অনেক কবিতাই কবিতা নয়, জার্ণাল। আমাদের মনে সমাজের, রাজনীতির, এবং দিনযাপনের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ার ভার কতটা সইতে অথবা বইতে পারে কবিতা, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সেদিন পার্ক স্ট্রিটের বীয়ারের পর, বেশ জমেছিল কিন্তু, বন্ধ ছাতা বৃষ্টির ভিতরে এলে খুলে যায় যেমন, জলের তলায় বুদ্‌বুদের তোলপাড়, আরও একটু পড়লে আরও তলাকার কান্না-কষ্টগুলো হয়তো, কিন্তু কী করব বল্‌, তেপান্তরে ঘর, আর এ শালার শহর দশটা বাজলেই কানা-খোঁড়া, বাড়ি ফিরতেই মনে পড়ল কথাটা, কথা নয় গল্প, আসলে উপন্যাস, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে শুরু, পতঙ্গের সঙ্গে আগুনের প্রথম সাক্ষাৎকার, মিল-দেওয়া পয়ারের মতো বাতাসের ভিতরে দু-হাজার বছর আগেকার ভুলে-যাওয়া বেলফুলের গন্ধ, নানা জন্মের স্মৃতি, শুধু স্মৃতির চুলে পাক ধরে না কখনো, বলব বলব করেও পাঁচ কথায়, আরেক দিন যদি বসিস, পার্ক স্ট্রীট বা অন্য কোথাও, তুই আমার বাঁ দিকের পেখমের নক্‌শা দেখে যখন ঐ সব বলছিলি, শিকড়-বাকড়, বজ্র-বিদ্যুৎ, হাওয়ার ছাপ, সাপের জিভের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়ার সিঁড়ি, তখন বাঁদিকের পেখমটা মুখ লুকিয়ে, বড্ড লাজুক, নিকটতম ছাড়া কাউকেই দেখাবে না তার পালকের অগ্নিচিহ্নময় উল্লাস, কবে দেখা করবি জানাস।

২

সাবানে হাত না ধুলে
সকালের আঁশটে গন্ধটা বিকেল পর্যন্ত।
মায়াকভস্কি,
তোর নিশ্চয়ই মনে আছে,
কারো সঙ্গে হ্যাণ্ডশেকের পরই
হাত ধুতেন সাবানে।
পকেটে সব সময়েই এক টুকরো সাবান।

চুল এলিয়ে বসে আছে সে
কেবল বদলে বদলে পরছে নতুন শাড়ি
গেলাস ফুরোলেই এগিয়ে দিচ্ছে
আরেক গেলাসের তৃষ্ণা।

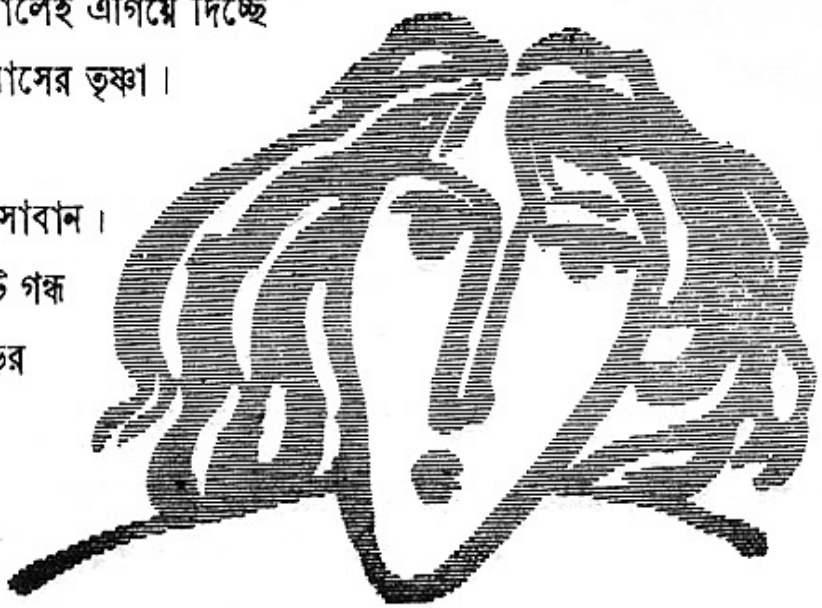

আশ্চর্য এক সাবান।
সমস্ত আঁশটে গন্ধ
জামা-কাপড়ের

কিংবা ভাবনা-চিন্তায় যতো রক্ত ছাপ
সব কিছুকে আদিম শুদ্ধতা
আদিতম ডমরুধ্বনির কাছে পৌঁছে দিতে
জলের সমুদ্রে খোদাই করে চলেছে
ফেনার উৎসব।

মায়াকভস্কি,
তোর নিশ্চয় মনে পড়বে
এলসা ত্রিয়োলের কাছে
সাবান চেয়েছিলেন কতবার।
তোর মনে হয় না ঠিক সময়ে
হাতে সাবানের টুকরো পেলে,
প্রতিপক্ষের করাত যতই হ্যাংলা হয়ে উঠুক না কেন
রক্তের খিদেয়,
আত্মহত্যা অসম্ভব ছিল
মায়াকভস্কির।

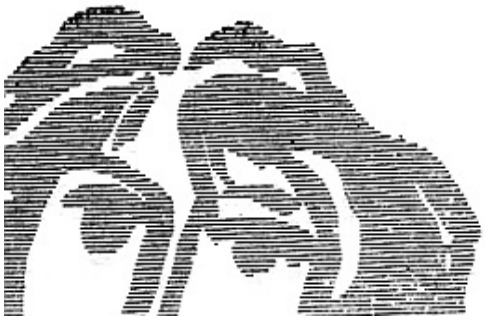

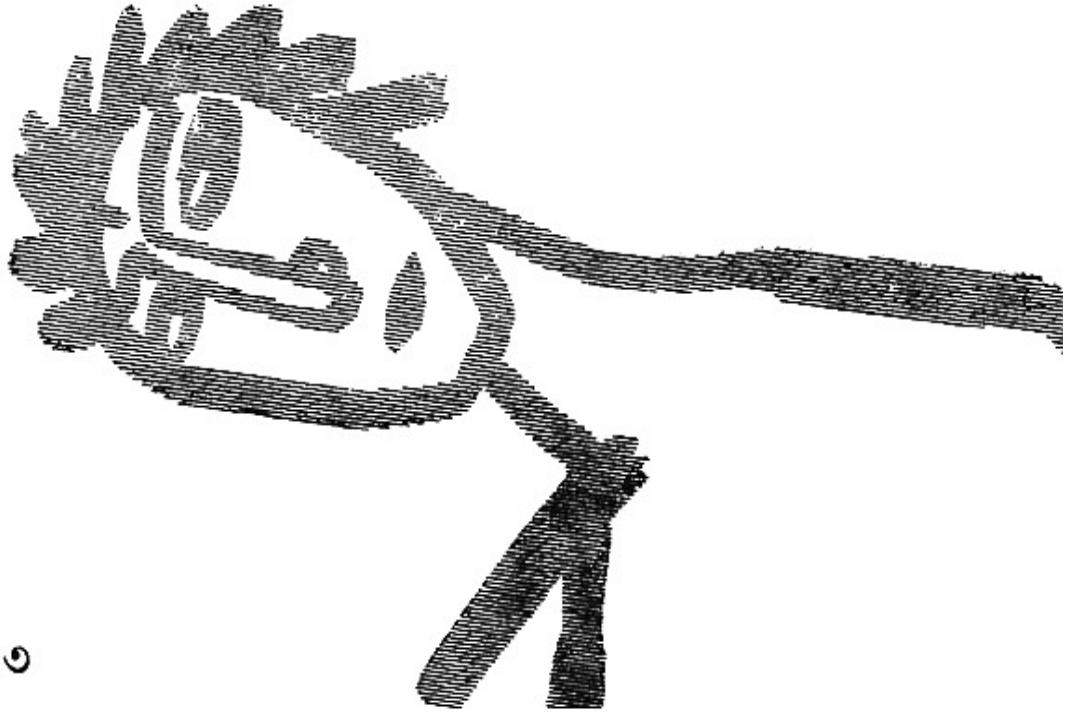

৩

মেছোহাটার সেলুন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে গেল যে লোকটা মাথা কামিয়ে
তাকে চিনতে পারলি ?
মনে পড়ছে লোকটার ঐ চুলগুলোকে কখনো মিছিলের পতাকা
কখনো অগ্নিকোণের ঘনঘটাময় ঝড়ের স্বরলিপি ভেবে
বিশ্বাসের ত্রিশূলে অন্ধকারের দরজা ভেঙে আমরা একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম
রাক্ষুসে হাওয়ায়।
চুল বেচে লোকটা এখন চলেছে ধোপার বাড়ির দিকে
কাচতে দেবে গায়ের জামাটা।
জামা থেকে জবাকুসুমের রঙটা উঠে গেলেই
মনে হচ্ছে সোনার ধানদুব্বো দিয়ে বরণ করবে কেউ।

৪

একদিন তোকে বলেছিলুম না একটা সাংঘাতিক দৃশ্যের কথা, নিজের চোখে দেখা জাহাজডুবি, মাইরি, একটা ঢলঢলে যৌবনের জ্যান্ত জাহাজকে, ঢেউ-ফেউ কোথাও কিচ্ছু নেই, যেন সূর্য উঠছে, সহজ সরল, আড়াই লক্ষ বছরের একটা ঘুমন্ত আগুনে পাহাড়, এক ইঞ্চি, দু ইঞ্চি, সাত ইঞ্চি কুড়ি, ইঞ্চি, একশো, দুশো, কথা বলতে বলতে ভালোবাসা বাড়ে যে-রকম, ভালোবাসা বাড়তে বাড়তে রক্ত মাংস যেমন জিরাফের মতো লম্বা, সেইভাবেই, শেষ কবে দুঃস্বপ্ন দেখেছিস তুই, শেষ কবে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়েছিস হাসপাতালের টেবিলে, উন্মাদ চাউনিতে আকাশ জুঁ পিও-র ঘোড়ার চাইতে তীব্র বেগে পালাচ্ছে পৃথিবীর উপর দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে, এই জাহাজডুবির কাছে সে-সব এমন কিছুই মারাত্মক নয়, বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, ডুবোজাহাজটাকে বুকে জড়িয়ে, ভাঙতে ভাঙতে, গড়তে গড়তে, নদীর জল লজ্জায় লাল, আড়াই-লক্ষ বছরের খিদেয় জেগে উঠে সে কখনো ঘুমোতে পারে শুধু চুম্বন আর আলিঙ্গনে ?

৫

যার কপালে যা আছে হবেই।
আবহাওয়া আপিস বলেছিল আকাশ থাকবে
রাজহাঁসের ধোয়া পালক।
অথচ দুপুর হতে না হতেই জাফরান রঙের আকাশটার গায়ে
ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে আচমকা ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সে
কোলের উপর শুইয়ে বিদ্যুতের ছুরিতে
ত্বরিত এক অস্ত্রোপচার।
যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি মাথাভর্তি কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়
আর শিয়র জুড়ে তার তাঁতের শাড়ির জড়িদার আঁচল।

কম নয়, প্রায় বছর পঞ্চাশেক আমরা এই পৃথিবীতে, পৃথিবীতে কতজন আছি ভাবতে গেলে মাত্র অল্প কজনের মুখ, যেন মাত্র শ দেড়েক, আসলে গোনা-গুনতি করি শুধু সেই কজনকে যাদের বুকের ব্যাণ্ডেজে লাল ছোপ, আর যারা সারা রাত লম্বা আলোকস্তম্ভগুলোকে গিলে গিলে মাতাল, দৌড়তে চায় আকাশ ছিঁড়ে, যেন নক্ষত্রপুঞ্জে আড়াল হয়ে আছে জাহাজ চলাচলের সব চেয়ে শৌখিন এবং সম্ভ্রান্ত স্টেশনটা, আর এইমাত্র রাষ্ট্রবিরোধী গীটারে রক্ত-রোদের তার পরাতে গিয়ে নিহত হল যারা, এমনকি কিছু কিছু মৃত মানুষকেও আমরা গণনা করে ফেলি, ভেজানো ঘরের দরজা খুলেই দেখতে পাই চেয়ার-টেবিল, কাগজ, কলম, কাঠের আলমারি, পর্দা, পাপোষ জুড়ে বসে আছেন তাঁরা, এই শ দেড়েক মানুষের মধ্যে অবশ্য আরো কেউ কেউ থেকে যায় যারা মুকুটের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকে পড়ে মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক টুকরো শিকড়ের দিকে, পাশা খেলতে বসে যারা পণ হিসেবে পাশে রেখে দেয় নিজেদের আপোষহীন হৃৎপিণ্ড, আর যারা কিছুতেই সায় দেয়না শিকল-পোড়ানো চিতার আগুনে জল ঢালতে।

ভিয়েতনামের আকাশে যখন ফিন্‌কি দিয়ে ওঠে আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণের ঝনঝনে হাওয়া, তখনই কেবল মনে পড়ে যায় আরো সব মানুষের মুখ, যখন হিরোসিমা পুড়তে থাকে তখন পাঁজরের ডানদিকে বাঁদিকে অসংখ্য মা বোন ভাই, আফ্রিকার কালো অরণ্যে শিকারী-বন্দুকের জবাবে যখন গমগম বেজে ওঠে মরণাপন্নের চরম দুন্দুভি, লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘর দোর দরজা দালান ছাদ সিঁড়ি লম্বা করিডর। অমিতাভ, তোর কখনো মনে হয়েছে, আমাদের হৃদয়ের মাপ নিয়েই এই পৃথিবী ?

৭

অনেক আগে তোকে একটা পাখির খবর শুনিয়েছিলুম।
তারপর অনেক দিন তুই বেপাত্তা
আর আমিও পাখিটাকে নিয়ে হিমসিম।
দিনরাত তার একটাই বায়না
চাইলেই আমাকে হতে হবে তার উড়বার আকাশ।
জলে-জঙ্গলে, কলে-কব্জায়
চব্বিশ প্রহরে আমার ছত্রিশ রকমের কাজ।
সব ছেড়ে-ছুড়ে কখন ওর চোখের মাপের আকাশ হই বলতো?
না হলেই সারা গায়ে ডানা-ঝাপটানির চাবুক।
একদিন আয় না,
এলেই দেখতে পাবি গা-ভর্তি লাল পালক, নীল পালক।

৮

এর মধ্যে মীরা মুখার্জীর বাড়িতে একদিন।

বাড়ি তো নয়, ব্রহ্মাণ্ড।

ইচ্ছের দগদগে আগুনে পুড়িয়ে ধাতুর ব্রহ্মাণ্ড।

জলের লতানো নক্‌শায় আঁকাবাঁকা মানুষ, মাছ, মাছ ধরার নৌকে

সাঁই সাঁই বাতাস, গুমরোনো মেঘ, লণ্ঠনহীন অন্ধকার

উথাল-পাথাল নিরাশার ভিতরে জীবনযাপনের যুদ্ধ

ওদিকে নভোমণ্ডল, নক্ষত্র-সভার মণি-মুক্তো বিছোনো আকাশ

যেন পৃথিবীর মহাসংগীতের সামিয়ানা।

ঘুড়ি উড়ছে, ঘুড়ির সঙ্গে মানুষের সুখ স্বপ্ন

মানুষের চেয়ে ঘুড়িগুলোই বড়ো,

অর্থাৎ মানুষের চেয়ে বড়ো মানুষের স্বপ্ন-সদিচ্ছাগুলো।

কান্না, কষ্ট আর সর্বস্ব-হারানো আর্তনাদেরা

মানুষের চেহারায় এক বুক বন্যা পেরিয়ে, গায়ে গা, পাঁজরায় পাঁজরায়

একশো জনে মিলে একটা গোটা মানুষ।

ছড়ানো-ছিটোনো এমন সব মুখ, যা পোকায় কাটা

এমন সব মুখ, যা রক্তাক্ত প্রদীপের শিখা

এমন সব মুখ, যা খুলে দেয় বাগানের দরজা

এমন সব মুখ, যাকে চুম্বন করলে মানুষ হয়ে যাবে

আরেক আভার পৃথিবী।

৯

সেদিন যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়েছি বাসে, এসপ্ল্যানেডে নামার কথা, আগে কাসেম আলির দোকানে প্যাণ্টের ট্রায়াল, তারপর জি, সি, লাহার রঙ তুলি ; অমলেন্দু এসেছিল কাল অপিসে, ওর মলাট, ফর্মা-টর্মা সব ছাপা, অমলেন্দুর গল্প নিয়ে বোধহয় আবার একটা সিনেমা, হতভাগাটা লিখছে বেশ, জানে, মানে দেখেছে, তবে হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন, ওঃ, সেদিন এস ফিফটিনে যেতে যেতে, আসলে আগের দিন সারারাত জেগে, কী একটা হৈ হৈ চীৎকার খালপাড়ের দিকে, চোর না বাঘ না খুন-জখম, না ডাকাত, সাংঘাতিক হৈচৈ ; গোটা পাড়াটা জেগে, কিসের হৈচৈ জানা গেল না কিন্তু, এখন একবার ঘুম ভাঙলে আর আসে না, ঘুম ভাঙলেই ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ, ঘুম ভাঙলেই ঝন ঝন টেলিফোন, চিঠি, টেলিগ্রাম, ট্রাঙ্ককল, ঘুম ভাঙলেই ঘুঘুর ডাক, মেঘের গজর গজর, বন্যার হুমকি, ঘুম ভাঙলেই পশ্চিমবাংলার লাটসাহেবকে নিয়ে পাঁচরকম, ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে পাঁচরকম, পোলাণ্ডের ধর্মঘটকে নিয়ে পাঁচরকম, ঘুম ভাঙলে, কোথাকার কে হরিদাস পাল, আমার ঘাড়েই যতো রাজ্যের বাজেট-বিতর্ক।

১০

হ্যাঁরে,
তুই কি শিলিগুড়ি যাচ্ছিস কবি সম্মেলনে ?
আমি কথা দিয়েছিলাম বটে কিন্তু পারব না।
১৭ সেপ্টেম্বর কাগজ কলমের জরুরি চাষ-বাস
১৮ সেপ্টেম্বর সিনেমার গায়ে গয়না-গাটি
১৯ সেপ্টেম্বর তুলি কালির মোচ্ছোব
২০ সেপ্টেম্বর নাছোড়বান্দা পাখির সঙ্গে আকাশ।

১১

বুঝলি, আকাশটার বোধহয় পেচ্ছাপের দোষ, এখুনি ডাক্তার না দেখালে কলকাতাকে ভিজিয়ে-ভাসিয়ে, কলকাতার জন্যে সত্যি খুব দুঃখ হয় এক এক সময়, আমরা মরে গেলে কলকাতায় এত সব ভিজে কাঁথা-কানি কে শুকোতে দেবে রোদ্দুর জালিয়ে ? সেই ৪৮-৪৯ থেকে রোদ্দুর জালিয়ে আসছি আমরা, একটানা, আমাদের যেন ঘর-সংসার বৌ-বাচ্চা নেই, এম-এল-এ মন্ত্রী হবার ইচ্ছে নেই, ব্যাঙ্ক ডাকাতির ইচ্ছে নেই, না মরলে কলকাতা কোনোদিনই বুঝবে না রোদের সুতোয় তার পাছাপেড়ে লাল শাড়িটা কাদের হাতে বোনা।

১২

অমলেন্দুর ধারে কাছে যাস না এখন
গেলে
তার নতুন উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের দুর্দান্ত ভূমিকা নিয়ে
দুর্গারা কেন মরে তার সাতকাণ্ড
দুর্গারা কী করে বাঁচে তার সাতকাণ্ড।

একদম ধারে-কাছে যাবি না এখন দেবেশের
গেলেই
ফরাসী অক্ষরে পিকাশোর একটা কবিতা ধরিয়ে দিয়ে
অনুবাদটা কখন পাচ্ছি
কখন পাচ্ছি অনুবাদটা ?

সিদ্ধেশ্বরের ছায়া মাড়াস না এখন
গেলেই
নতুন কবিতার গেলি-প্রুফটাকে মরা পাখির মতো জাপটিয়ে
কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ
পূর্ণচ্ছেদ, কমা, সেমিকোলন।

অমিতাভ
আমার ত্রিসীমানাতেও ঘেসবি না এখন
এলে
মচকানো বেহালা থেকে খসে গেছে যে সুর, তার শোকে
এবেলা কান্নাকাটি
ওবেলা কান্নাকাটি।

এ-বছর ও-বছর মিলিয়ে অনেক কিছুই দেখা হল আমাদের।
তবে সূর্যের আলোটা
অনেক দিনের না-কাচা পাজামা-পাঞ্জাবির মতো ময়লাটে।
এমন হতে পারে
যে-অগ্নি-কোলাহলের ডানায় বাতাস কেঁপে উঠলে
সে বুঝতে পারত পৃথিবী তার নিজের চেয়ার-টেবিলে
আগের মতোই আঁটোসাঁটো,
সেটা দেখতে না পেয়েই অমন মন খারাপের আঁচড়
চোখে-মুখে।
সূর্যের চোখ ঘোলাটে হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই,
কেননা লোডশেডিং-এ আমরা শিখে নিয়েছি
মোমবাতির-কাঁপা আলোতেও কিভাবে পড়ে নিতে হয়
সময়ের ছাপতে-দেওয়ার-আগের পাণ্ডুলিপি।
কীভাবে বাঁক নিচ্ছে নদীরা,
কিংবা পাথর ফাটিয়ে কীভাবে জল-মিছিল।
মুছে যেতে যেতেও কীভাবে এই শতাব্দীর ফাটা দেয়ালে
লেগে থাকে পুরনো শতাব্দীর
দেয়ালগিরির জাফরান আলো
সেসবও পড়ে নিতে পারি এখন কত সহজে।

১৪

তুই সেদিন, বুঝতে পারছিস কোনদিন, কলকাতাকে গিলে খেল
জল, জলের ফ্রেমে আটকানো প্রকাণ্ড অ্যাকুয়ারিয়মের মতো কলকাতা,
বিপন্ন মানুষ এক পা এগোলেই জলের মাছ, ট্যাকসি-মিনি ছুটতে
চাইলেই জলের মাছ, তিরিক্ষি অন্ধকারে লম্বা ল্যাম্পপোস্টগুলোর
চোখে আলোর চিলতে জ্বলতে না জ্বলতেই জলের মাছ, জলের ডুগডুগি
বাজিয়ে ঝানু ম্যাজিসিয়ানের মতো কলকাতা সেদিন মাছের খেলা দেখাল
বটে একখানা, ছেলেবেলায় হাঁটু-জল ঘেঁটে হাটে-বাজারে-ইস্কুলে, বাল্য-
কালের অর্ধেকটাই তো জলে, বাঁধ ভাঙার চিৎকারে মাঝরাত কেঁপে
উঠেছে প্রত্যেক আষাঢ়-শ্রাবণে, তলিয়ে যাওয়ার ভয়ে তবুও
হাড় কাঁপেনি বুক-জলে দাঁড়িয়ে, সেদিন কিন্তু শিউরে শিউরে, কি করে
বাড়ি ফিরলি তুই, আমি, কোনোমতে একটা এল. থ্রি. সি. নামের
লাল রাঘব বোয়ালের পেটে সেঁধিয়ে।

১৫

কামান দাগলে যেমন হয়
আগুন-হাওয়ার তোড়ে
ছিটকে যায় হাত-পায়ের অর্ধেক,
সেই রকম একটা ভাঙা আয়নার সামনে
দাঁড়িয়ে।
কিংবা মনে কর
ঐ রকম একটা আয়নাই
এখন আমার ঘরের দেয়াল
নাটকের একমাত্র দৃশ্যপট।

কাঁচের টুকরোর ভাঙাভাঙির ফাঁক দিয়েই
প্রবেশ এবং প্রস্থানের দরজা
ঘনিষ্ঠ এবং আগ্নেয়
দু-রকমের সংলাপের
অথবা যখন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ
কিংবা খোলা-তরবারির লড়াই
রণক্ষেত্রে অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে
অথবা হাঁটু মুড়ে যখন ভালোবাসার সামনে
দু-হাতের তালু জুড়ে গিয়ে গোল বাটি
পূর্ণতার ভিক্ষাপাত্র
সেই ঢালুতে আছড়ে পড়ছে
চণ্ডালিকার জল
খাচ্ছি
খেতে খেতে ছড়িয়ে যাচ্ছে
গোপন স্নানও হয়ে যাচ্ছে যেন

সেই দুষ্প্রাপ্য জলধারায়
আয়নার বিদীর্ণ টুকরোয়
সমস্ত, সব দৃশ্য
সব রকমের উত্থান ও পতন
মানুষের মুখে গাছের ফুল
ফুলের চারপাশে মানুষের পাপড়ি
খুন-খারাপির রক্ত ঘাঁটতে ঘাঁটতে
মানুষের চেতনায় সন্দেহ, ক্রমে প্রশ্ন
প্রশ্ন থেকে চিৎকার
চিৎকারে টাল-খাওয়া পাহাড়
পাহাড় ফাটিয়ে প্রতিধ্বনি
সারারাত জেগে ভুল ভাঙা
ভুল ভাঙতে ভাঙতে
ক্ষতচিহ্নে জোড়া লেগে যাওয়া
আমাদের গোটা অর্থাৎ আস্ত হয়ে ওঠা
কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না সম্পূর্ণ
অথচ আমরা হয়তো সম্পূর্ণ
আবার আমরাও হয়তো আপাদমস্তক
একজন নই
নানা টুকরোর জোড়
নানা অস্থি অথবা অস্তিত্বের ফালি জুড়ে জুড়ে
গোল বৃত্ত
এই ভাবেই ভাঙা আয়নার সামনে
কিংবা ভাঙা আয়নার ভিতরে
অথচ একটা গোটা আয়নাই ছিল

আমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠার
বৈদ্যুতিক আকর্ষণ
আমাদের লাঙল
ফলা চালিয়েছিল সেইভাবেই
মাটিতে
স্বপ্ন-সংকল্পের ত্বরিত জাগরণের চেয়ে
আমাদের প্রস্তাব ছিল এমন দৃশ্য রচনায়
যা সূর্যের মতো নিজের আলোয় সম্পূর্ণ।
এখন
ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
তুই যখন নিজেকে দেখিস
অথবা আমি আমাকে
অথবা আমাদের দুজনকে অন্য সকলে
অথবা আমরা সমস্ত কিছুকে
আর আয়নার ভাঙা পরকলাগুলো
সময়ের মার খেয়ে যাদের পিঠে রক্ত দাগ
তারাও কি আমাদের বলতে চায় কিছু ?
কিংবা আমরা হয়তো
আয়নার চৌচির ফাটলের খুব গভীরে
পৌঁছতে পারি নি এখনো।

১৬

তোর সঙ্গে কিছু গোপন কথাবার্তা ছিল অমিতাভ, মন-মেজাজ ডাইনির মাথার জট্, নদীর অর্ধেকটাকে কামড়ে খেয়েছে চর, হাঘরে চরটা যখন বিষণ্ণ চিতাবাঘের মতো, নিজের প্রতিকৃতি দেখতে পাই আমি, যখন যা বলি মাঝখানে ফোঁটা ফোঁটা, যখন যা ভাবি মাঝখানে ফোঁটা ফোঁটা, যখন যা আদরে গড়ি মাঝখানে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে খুচরো পয়সার মতো গলে যায় কৃতজ্ঞতাহীন স্বপ্নেরা, যেন জামার কাপড়টা ঢুকে গেছে সেলাই কলে, চাকা ঘুরছে, সুতরাং ফেরার রাস্তায় খিল, আর এগোনো মানেই ক্রমাগত এফোঁড়-ওফোঁড়, কাটা-ছেঁড়া যা হবার সে সব তো আগেই, সাইজমাফিক, ছাতি ৩৮, ঝুল ৪২, মহুরি ১৪, কিছু হওয়ার ইচ্ছে মানেই আগে দীর্ণ-বিদীর্ণ, নিঃশব্দ চুরমার, রান্নার আগে যেমন চালকুমড়োর ফালি, পরে হওয়া না-হওয়া, যে যতো বড় তার রক্তনাড়িতে ততো লম্বা সেলাইয়ের দাগ, কিন্তু আমি কি শুধু নিজের জন্যেই দুঃখিত, চিরে চিরে নারকেল পাতার মতো ব্যথা-বহুল, যেতে যেতে উল্টে পড়ে যে-সব মিনিবাস এবং মানুষ, সে-সব মানুষের পিছনের পা দুটোই নিজের, সামনের দুটো পায়ে পরস্মৈপদী ঘুঙুর, আকাশের এত বড় আয়না থাকতে যারা নিজের মুখ দেখে জুতোর পালিশে, সেই সব এবং আরও অনেক ১৮ তলা বাড়ির ভাঙচুর নিয়েও তোর সঙ্গে অনেক গোপন কথাবার্তা ছিল অমিতাভ

১৭

নিশ্বাস নিতে যখন খুব কষ্ট
গোটা রাতটাই বুকে বালিশ চেপে।
জেগে থাকাটা যখন
বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার মতো,
আর নিশ্বাসের দিকে তাকাই না।
তাকাই খিল আঁটা দরজার দিকে
যদি খুলে যায় হঠাৎ।
পর্দা-ঢাকা জানালাগুলোর দিকে তাকাই
যদি এক ঝটকায় তাদের চৌচির ছিঁড়ে
আকাশের নীল টুকরো ঢুকে পড়ে হঠাৎ।

ভোর হচ্ছে
পৃথিবীর ভিজে পালকে লেগেছে তার
লালচে ঠোঁটের প্রথম ছোঁয়া
এই খবরটুকুর জন্যেই
হাঁপরের মতো হাঁপিয়ে, সারারাত।
ভোর এসে গেলে
আমার নিশ্বাস আর আমাকে ছিঁড়বে না।

১৮

সেইসব সময়কে খুব ভালো লাগে,
যখন তুই আর আমি
দুজনে মিলে লাখখানেক কিংবা লাখখানেকের সঙ্গে মিলে
তুই আর আমি
একজন।

সেইসব সময়কেও খুব ভালো লাগে
যখন আমি আর সে
দুজনে মিলে
একটা হলুদ ডানার পাখি।

১৯

পরশু তুই যখন আমার স্টাডিতে, আমি রবীন্দ্রসদনে,
কণিকার গান,
অনেকদিন পরে ধূপ-দীপের মতো একটা সন্ধে।
গানের প্রদর্শনী, সুরে-আঁকা ছবি, ছবির গায়ে
মেঘের আসা-যাওয়া।
কিন্তু জিজ্ঞেস কর্, কী কী গান ? জানি না।
গান কই ? আমি তো শুনেছি বাঁশি।
অন্তরীক্ষ থেকে নেমে নিয়ে যায় আর এক অন্তরীক্ষে
যে শূন্যতা নিয়ে এসেছিল, পেয়ে গেল বিভাসের রাজমুকুট
যে বেদনায় ছিল, সে পূরবীর সোনার সিংহাসন।
যেখানে পারাপার অগম, সেখানে
নদীকেই নৌকো বানিয়ে দিল সে।
কিন্তু এসব তো মনে হয়েছে পরে।

শোনার সময় আমি মৃত।
আমাকে তার বাঁশি বানাবে বলে, গানের করাত
চিরে চিরে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে, তখন কিছুই আর গোপন নয়
আমি নিঃস্ব, নগ্ন সর্বস্বহীনতায় রাজাধিরাজ।
সবচেয়ে মজার কথাটা এই
গান যখন তার রঙিন চাঁদোয়ায় মুড়ে ফেলে আমাদের
কিছুই অসম্ভব মনে হয়না আর।
শ্যাগালের ছবির মতো উড়ে যেতে পারি আমরা,
জানলার ফাঁক দিয়ে রোহিনী নক্ষত্রের নীল উদ্যানেই
হয়তো আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বিছানা,
হয়তো বা সূর্যের ভিতরে যে একুশতলা আলোর হাসপাতাল
সেইখানেই সমস্ত কান্নার আরোগ্য।
গানের সময় আমাদের পিঠে দেবদূতের ডানা।

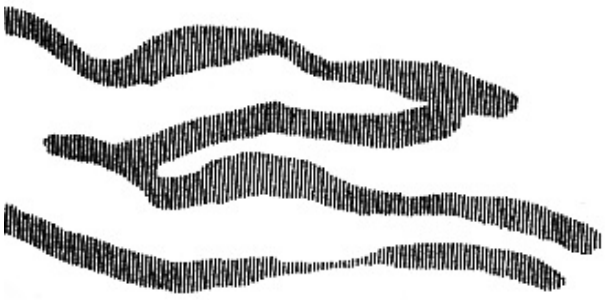

২০

একটা পূর্ণচ্ছেদ টানলেই
জানিস অমিতাভ
শেষ হয়ে যায় লেখাটা।
অথচ সেইটেই না পেরে কেবল ছটফট।
কেবলই মনে হচ্ছে
অনেক ভুল শব্দ ঢুকে পড়েছে ভিতরে।
পুলিশের কালো গাড়ি দেখলে
ফুটপাতের হকার যেমন
অলিগলির মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়
ভীষণ কোনো রথের চাকার শব্দে
সেইভাবেই ছত্রখান হয়ে যাবে ওরা।
হাত-পা ভাঙা শব্দগুলোর
কেউ কেউ তখন ফার্স্ট এডের জন্যে হাসপাতালে

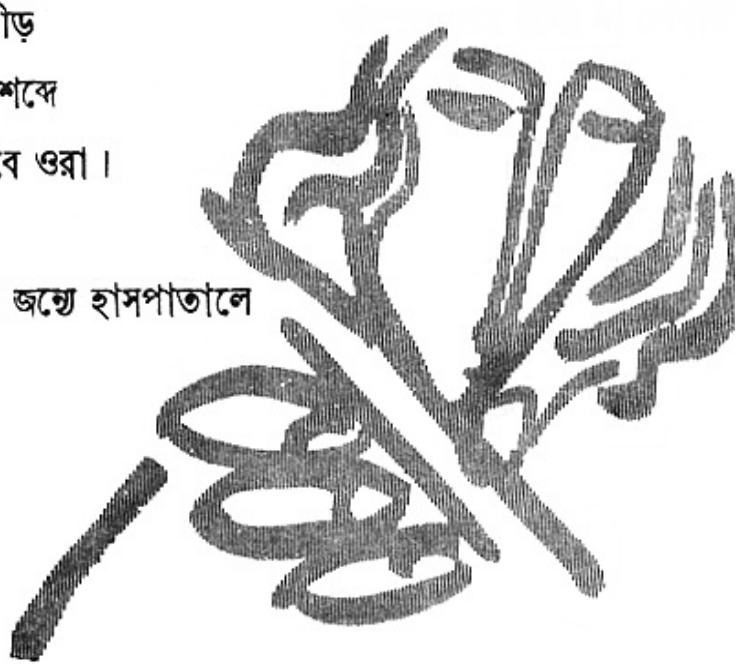

কেউ কেউ সটান চুল্লিতে।
তার মানে
যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছি সেই সব শব্দকে
নিজের অহঙ্কারে যারা সোজা বল্লম
অথবা বিশ্বাসে ধনুক
অথবা আগুন চিবিয়ে লাল
অথবা অনেক নদী-নালা পেরিয়ে
মাজা-ঘসা পাথর
ততক্ষণ শেষ হচ্ছে না লেখাটা।

অর্থাৎ
আমাকেই এখন নিজের হাতে ভাঙতে হবে
নিজের অজ্ঞাতবাসের দুর্গ।

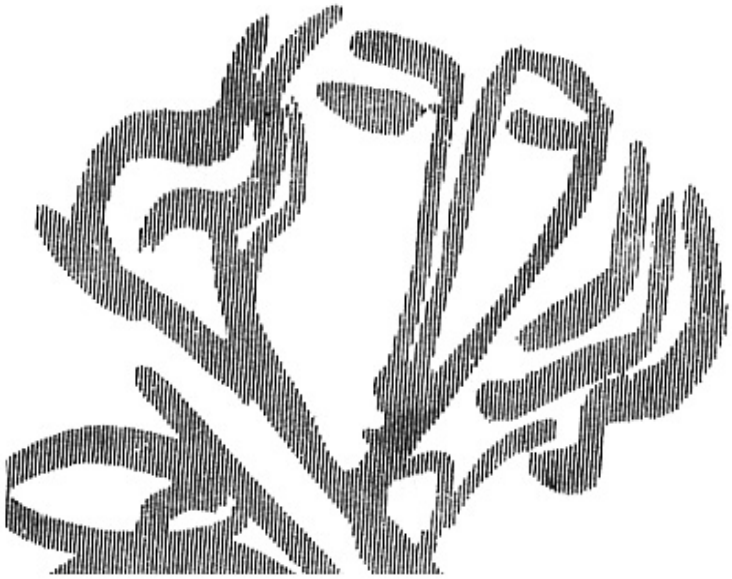

২১

কবিতাকে
শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখতে
আর ভালো লাগে না আমার।
আমি চাই
হাই জাম্পের মতো লাফিয়ে উঠুক কবিতা
ফুটবলের মতো পায়ে পায়ে
অগ্নিবেগে ছুটে যাক
চূড়ান্ত গোলপোস্টের দিকে।
কবিতা হয়ে উঠুক
উইকেট-ভাঙার
আচমকা লাফিয়ে-ওঠা বল
অথবা
কোনো বেপরোয়া কব্জির
উল্কামুখী ছক্কা।

২২

কোলে শুয়ে
বুকে জ্যোৎস্না-হিমের দোলনায়
কাতুকুতু খেয়ে গড়াতে গড়াতে
কাতুকুতু খেয়ে গড়াতে গড়াতে
মাঝরাতের মগডালে
হঠাৎ যেই কালপুরুষের ফর্শা কোমর,
অমনি সে এক লাফে আকাশে।
সে মানে আমার শাদা বেড়ালটা
আদরিণী আমার
সুখ-জাগানিয়া আমার
সকল দুঃখের প্রদীপ আমার
আমার ধূপ-ধুনুচি
লেপ-তোষক
এই সব গেয়ে

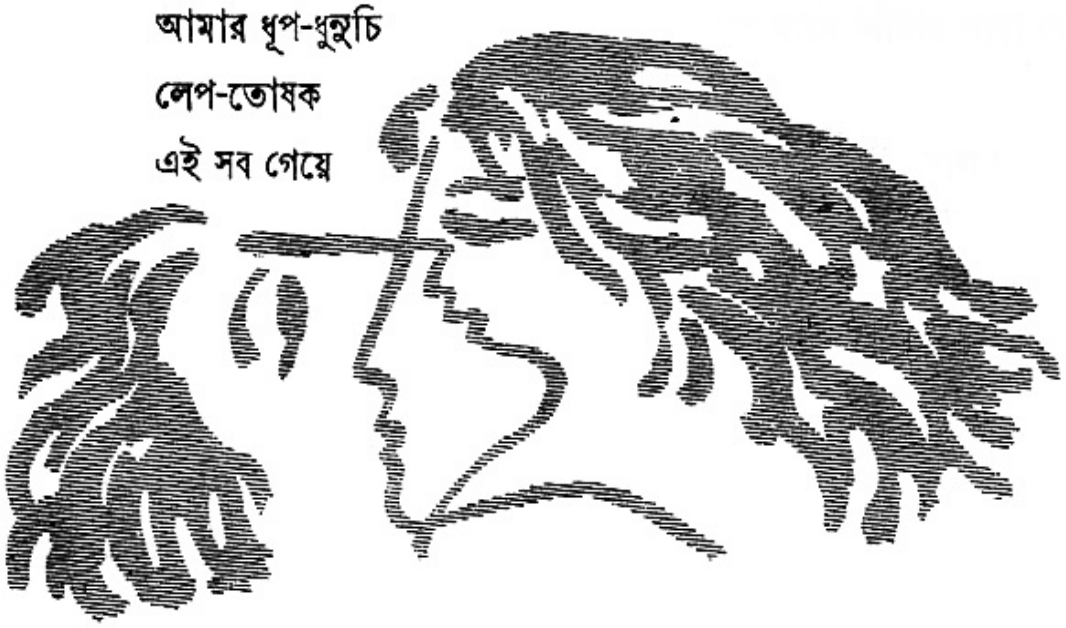

ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে ভেঙে খাইয়েছি যাকে।
বুকের উপর যখনই মাথা
সাত সমুদ্রের এলাচগন্ধ তুলে দিয়েছি ঠোঁটে।
আর থাবায়
মাটি লেগে থাকা অর্থাৎ শিকড়শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা
রাত-কাঁপানো আতসবাজি
ফোল্ডিং ছাতার মতো গোলাকার বৃষ্টিসুখ
যখন যা চেয়েছে, সব।
তবুও
চোখের খিদে মেটাতে
আকাশে দৌড়ল সে।
সে মানে আমার শাদা বেড়ালটা।
অমিতাভ
এই হচ্ছে দিনকাল।

২৩

বাল্মীকি-প্রতিভার শতবর্ষ, গত রবিবার সন্ধেয় সল্ট লেকে তাই
নিয়ে অনুষ্ঠান ছিল কাকলিদের, তোকে দেখলাম না, খোঁজাখুঁজি
হল অনেক।
বেশ করেছিল স্টেজটা, কালো পর্দার পটভূমিকায় শুধু একটা জলন্ত
হাঁড়িকাঠ, অন্ধকারেরই একটা রক্ত-লাগা দাঁত যেন, আর সেইই শুধু
স্থির, মঞ্চের সব কিছুই যখন আবর্তময়, যে-যার নিজের সমস্যায়
শঙ্কিত বলেই চঞ্চল, রিমঝিম বরষার মতো আসা-যাওয়া, উচ্চকিত
কোরাস, নিরাপত্তাহীন বালিকার নিভৃত রোদন, খড়্গের উপরে রোদ,
ব্যাধের হাসির উপরে রোদ, এমনকি দস্যুদলের রক্ত-পিপাসার উপরে
রোদ, রোদ মানে মঞ্চের আড়াল থেকে ছোঁড়া আলো।
হাঁড়িকাঠটাই শুধু অন্ধকারে, অথচ নিজের অহংকারে ষাঁড়ের
কুঁদের মতো দৃপ্ত, যেন জানে কী ঘটবে চারিদিকের রক্ত-চিৎকারের অন্তিমক্ষণে,
কে ফিরিয়ে নেবে চোখ ঘৃণায়, কে তার সর্বাঙ্গের শুকনো রক্তরেখার
আঁশটে গন্ধের পাণ্ডুলিপিটাকে ছুঁড়ে দেব আত্মধিক্কারের এক-গলা
জলে, আত্ম-আবিষ্কারের গুরু গুরু স্পন্দনে কে জেগে উঠবে হঠাৎ-পাওয়া
মন্ত্রধ্বনিতে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানবিক শাখা-প্রশাখায়।
সম্ভবত এইভাবেই সে অর্থাৎ ঐ রক্ত-ক্ষত হাঁড়িকাঠটা, বুঝে নিয়েছিল
নিজের ভূমিকা, আর সেই কারণেই সমস্ত ভ্রান্তি এবং জাগরণের কেন্দ্রে মৃত্যুদণ্ডে
দণ্ডিত অপরাধীর মতো অবনত ছিল সে, যেন ইতিহাস-জানা কোনো
স্ব-বিরোধী সত্তা।

২৪

ঘুম ভাঙার পর
স্বপ্নগুলোকে মুঠোয় ধরতে পারিস তুই ?
হাতের মুঠোয় যখন লাল ফড়িং
কিংবা রূপসী প্রজাপতির পরাগ-উড়ানো
ফিনফিনে ডানার কাঁপুনি
সারা শরীরে শিরশির শিরশির
ব্রহ্মতালু থেকে নাইকুণ্ডু পর্যন্ত
টালমাটাল,
এই রকম মনে হয় না তোর ?

অনেকদিন পরে
ভোরবেলার একটা স্বপ্নকে ফুরুৎ করে পালানোর আগে
পেয়ে গিয়েছিলাম মুঠোয়।

জলের মধ্যে ব্যাণ্ডপার্টি
সার্কাসের হলুদ-কালো তাঁবু
আগুনের গোল কেশর ফুঁড়ে সিংহ-লাফ
আর ছুটন্ত ঘোড়ার বিস্ফোরণ।
জলের কিনারায় আমরা।
সে আমার ভিতরে জলস্রোত
আমি তার ভিতরে মাতাল নৌকো।
বৃষ্টির ছাটে ছাপা বইয়ের পাতাগুলো
যেভাবে জুড়ে যায়
আমরা সেই রকম।
চিতাবাঘের পোশাক ছাড়তে ছাড়তে

আচমকা একটা মাছরাঙা
আমাদের মাঝখানে এসে বসে পড়ল ঝুপ করে।
আর তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে
ঠোকরাতে লাগল
আমার পায়ের তলার মাটি।
দৃঢ়মূল কোনো অবলম্বন না পেয়ে
ক্রমশ নীচের দিকে
জলের দিকে
সার্কাসের তাঁবুর দিকে
ব্যাণ্ড পার্টির বেলেল্লা মশকরার দিকে
গোল আগুনের গনগনে খিদের দিকে
নেমে যাচ্ছি আমি।
সে মাছরাঙার দিকে তাকিয়ে।
আর মাছরাঙাটা
এক এক করে পরে চলেছে সেই সব পোশাক
যা আমারই জন্যে সেলাই করেছিল সে
তার গোলাপি হাসির সুতোয়।

২৫

সেদিন উইণ্ডসরে বসে এক গুচ্ছ কবিতা পড়লি তুই।
তোর কবিতায় বুকের-বোতাম-খোলা গরগরে রাগগুলো বেশ ঝলসায়।
শব্দের ভিতরে আচম্‌কা বলাৎকারের ঠা-ঠা চুরমার।
আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব
সিনেমার কাছে চায় আকাঁড়া রিয়্যালিটি
আর কবিতার কাছে মন্ত্রের শুদ্ধতা,
আমি ঠিক এর উল্টোটাই।
সিনেমা হোক গুপ্তযুগের ভাস্কর্য কিংবা অজন্তা।
আর কবিতা, পরমাণু-শাসিত এই সময়ের
ময়লা উঠোন ফর্শা-করার খরখরে ঝাঁটা।

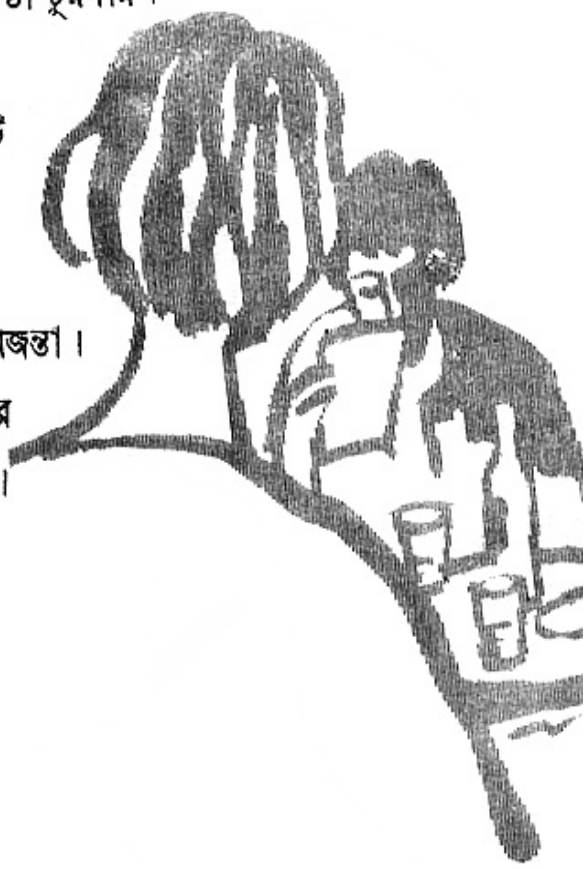

২৬

যা দাম হয়েছে বই-পত্তরের
ছুঁলেই হাতে ফোস্কা।
অথচ বই আর ভালোবাসাবাসি
জীবনের লাঞ্চ অ্যাণ্ড ডিনার বলতে তো
এই দুটোই।
বইয়ের তবু একটা সুবিধে
কোনও একদিন মিলে যায়
সুলভ সংস্করণ।
কিন্তু ভালোবাসার সবটাই
রাজ-সংস্করণ।
আর দাম
দুহাজার বছর আগেও যা
এখনও তাই।
একটা সোনালি বাঁটের ছুরি
আর লাল আপেল।

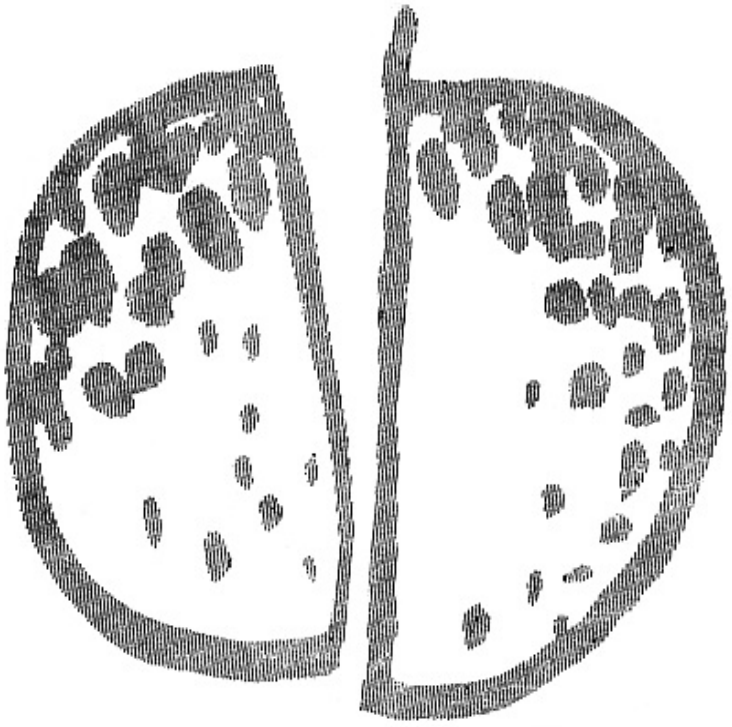

২৭

তোর জন্যে এক গুচ্ছ ছড়া নিয়ে বসে আছি, রাজনৈতিক,
ভেতরে মোষের বাঁকানো শিং কিন্তু বাইরেটা সোজা-সাপটা,
যেমন চেয়েছিলি, দেওয়ালেও লেখা যাবে লাল-কালোয়,
মুখে বলতেও মুচমুচে, ফাটা মাঠে
ছড়িয়ে দিলে গাছ, কামারশালায় গনগনে ফুল্‌কি।
প্রথম ছড়াটা এক মহানদীর বিষয়ে, নদীর পেটে
আলসার, আলসারের পুঁজ থেকে পোকামাকড়, তাদের
হিজবিজবিজ, তাদের গুঁতোগুঁতি, ছোরাছুরি, রাজা-সাজার
খেলা। পরের ছড়াটা সেই পরমাশ্চর্য রাজহংসীকে নিয়ে
ধবল তানার আড়ালে যিনি তা দিয়ে চলেছেন নিজের
ডিমটিকে, যার কুসুমে ঘুমিয়ে আছে ভাবী ভারতরত্ন।

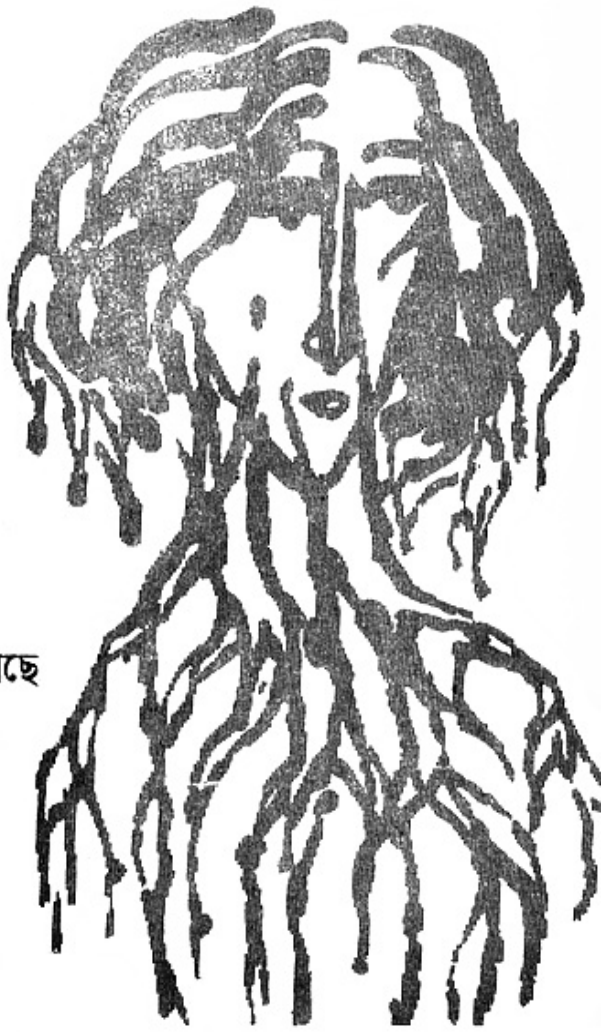

গানের শিকড়গুলো বড় সাংঘাতিক।
খুব আস্তে ভিতরে ঢোকে
মূর্তিহীন আবছায়ার মতো
স্নানের আগে জলের ভিতরে
দুটো শাদা পায়ের নেমে আসা যেন।
ক্রমে শরীরের
নগ্ন
নিমগ্ন
সর্বাঙ্গময় উন্মোচন।
যেন আকণ্ঠ তৃষ্ণার দিকে এগিয়ে আসছে
এক রক্তিম গোলাপের ঠোঁট,
ভীষণ পাওয়ার বিবেচনাহীন উল্লাসে
অস্তিত্ব জুড়ে নতুন জন্মের উলুধ্বনি
ভূমিকম্প
উদ্ধার
চরাচর-জোড়া মুক্তি
মুক্তির যন্ত্রণা
জ্বর
একেবারে কাঙাল হয়ে যাওয়ার সুখ-শান্তি।

কাল রাত দুটো পর্যন্ত
লং-প্লেইং-এ গান আর গান।
গানের শিকড়গুলো বড় সাংঘাতিক
অমিতাভ।

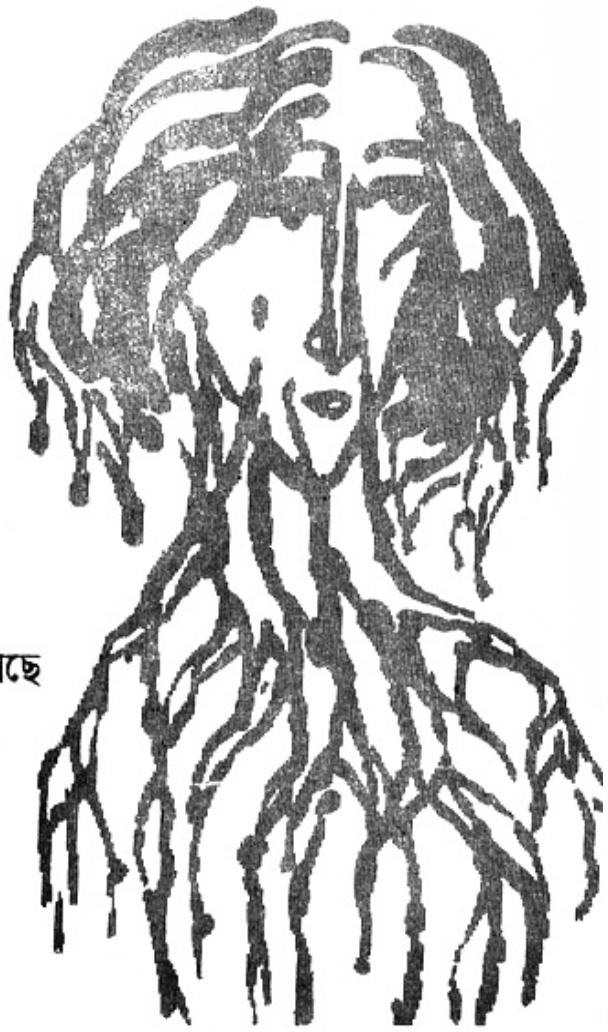

গানের শিকড়গুলো বড় সাংঘাতিক।
খুব আস্তে ভিতরে ঢোকে
মূর্তিহীন আবছায়ার মতো
স্নানের আগে জলের ভিতরে
দুটো শাদা পায়ের নেমে আসা যেন।
ক্রমে শরীরের
নগ্ন
নিমগ্ন
সর্বাঙ্গময় উন্মোচন।
যেন আকণ্ঠ তৃষ্ণার দিকে এগিয়ে আসছে
এক রক্তিম গোলাপের ঠোঁট,
ভীষণ পাওয়ার বিবেচনাহীন উল্লাসে
অস্তিত্ব জুড়ে নতুন জন্মের উলুধ্বনি
ভূমিকম্প
উদ্ধার
চরাচর-জোড়া মুক্তি
মুক্তির যন্ত্রণা
জর
একেবারে কাঙাল হয়ে যাওয়ার সুখ-শান্তি।

কাল রাত দুটো পর্যন্ত
লং-প্লেইং-এ গান আর গান।
গানের শিকড়গুলো বড় সাংঘাতিক
অমিতাভ।

২৯

সে এক কলকাতা ছিল আমাদের।
শ্যামবাজার ছুঁয়ে ব্রহ্মপুত্র
সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ জুড়ে গারো পর্বতমালা
আর হ্যারিসন রোডে চিতোরের সার সার দুর্গ।

বিরাট শামিয়ানার নীচে
সারা রাত নাচের গানের আর
কবিতার উৎসব।
যেখানে পা রাখছি
আগুনের আলপনা।
যেখানে হাত সেখানেই
রক্তরাখী।
তখন সূর্য সেন বলে হাঁক দিলেই
খুলে যেত এক লাখ দরজা।

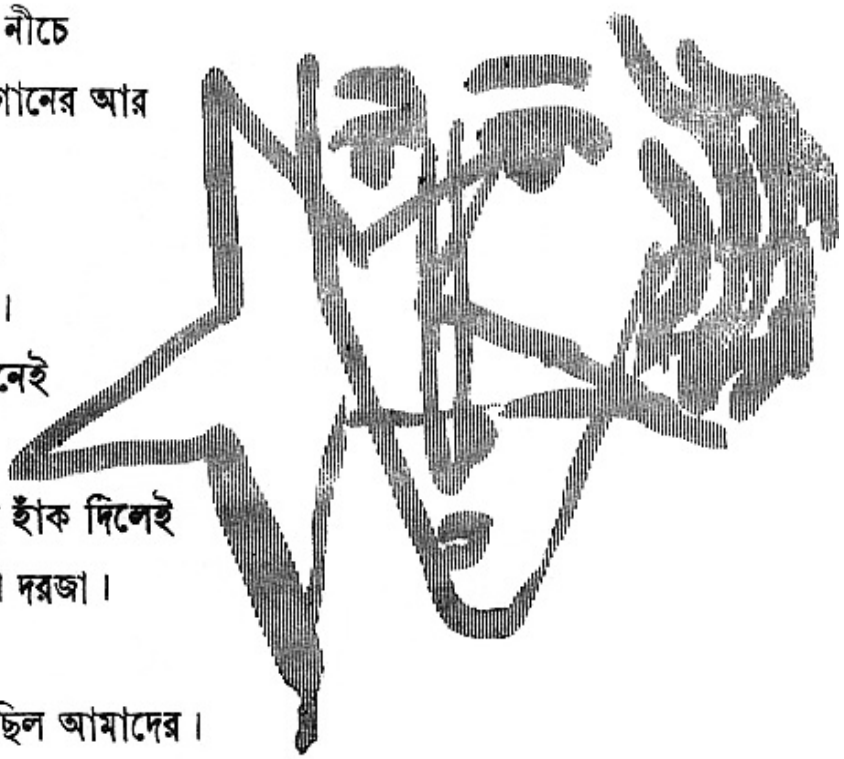

সে এক কলকাতা ছিল আমাদের।
কলেজ স্ট্রীটের গায়ে কাকদ্বীপ
ডালহৌসির ভিতরে তেলেঙ্গানা
আর রাজভবনের সামনে চট্টগ্রাম।

৩০

দেবেশের পাল্লায় পড়ে
কদিন ধরে অষ্টপ্রহর শুধু
পিকাসো আর পিকাসো।
চাঁদিপুরে গেছি শুটিং-এ
পিকাসো,
রাত বারোটায় ঝাউবনের ঢলঢলে বিছানায়
হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টির বলাৎকার
পিকাসো,
কলকাতায়
ইট-কাঠ সিমেণ্ট সুরকি গিলে খাচ্ছে
বসন্তকালের ফুলদানি
পিকাসো,
বিহারে
খরার ছাটে পুড়ছে হৃদয়ের দলিল-দস্তাবেজ
পিকাসো।
যখন পিকাসোকে হাতড়ে চলেছি
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়
হঠাৎ ডোরা মার চলে এল কাছে।
পিকাসোর বুকে যখন
ছারখার গের্নিকার সমস্ত কান্না আর ধ্বংস

যখন সাতাশো কামান
থরথর করছে পিকাসোর তুলির ডগায়
পিকাসোর রক্ত-দুন্দুভিকে ছুঁয়ে রয়েছে ডোরা মার।
পিকাসো
উদগীর্ণ আগ্নেয়গিরি হোক
অথবা মহাপ্লাবন ;
পিকাসো
ক্রুদ্ধ দুর্বাশা হোক
অথবা কুরুক্ষেত্র ;
উপঢৌকনে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে চলেছে ডোরা মার
প্রেরণা এবং প্রেম
বৃষ্টি এবং বসন্ত
গর্ভধারণের মাটি এবং বীজে।
বুক থেকে খরার আগুন নিভোতে নিভোতে
পরশু বিকেলে
অহংকারে টই-টম্বুর এক অপ্সরীকে
কী বলে ফেললাম জানিস ?
—তুমি হতে পারনা আমার ডোরা মার ?

৩১

আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'গালিবের গজল থেকে' নিশ্চয় তোর পড়া।
চমৎকার অনুবাদ। আরও চমৎকার পিছনের উত্তর ভাষ ইত্যাদি।
কাল একটা লেখার জন্যে আবার ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে
একটা শায়ের ভালো লাগল খুব।
"হোগা কোই এসা-ভী কেহ্ গালিব-কো নহ্ জানে ?
শায়র তো বোহ্ অচ্ছা হৈ কে বদনাম বহুৎ হৈ।"
নিজের জন্যে আমার স্বাধীন অনুবাদটা শুনবি ?
"মুলক জুড়ে সবাই জানে এই কবিটির নাম
কাব্য যদি দিগন্ত হয়, কুখ্যাতি আসমান।"

৩২

অমিতাভ, গভীর খাদের জট্-পাকানো অন্ধকার ছিঁড়ে একটা
পাথর কুড়িয়ে এনেছিলুম, সে তুই জানিস। ছেনি-হাতুড়ির ঘায়ে
তাকে গড়তে চেয়েছিলুম এমন এক নারী, দেখে মনে হবে
ঘুম ভেঙে এইমাত্র স্নান করে এল পৃথিবীর অগ্নিনির্ঝরে,
সেও তোর জানা। এর পরের ইতিহাস—
প্রথম ছেনির ঘা মেরেছি যেদিন, রক্তের ফিনকি। সারারাত
তার ক্ষতের উপরে হাত। তার শূন্যতার ভিতরে
সারাদিন জননীর মতো। যখন আর রক্তক্ষরণ
নেই, ক্ষত ভরে গেছে সবুজ পালকে, আবার ছেনি-হাতুড়ি
নিয়ে গড়তে বসা।

—কি পরাচ্ছ আমার গায়ে ?
—আগুনের শাড়ি। যা তোমার আত্মাকে মানায়।
—আমার ভিতরে কিসের গন্ধ ?
—রক্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলুম আকাঙ্ক্ষার বীজ। ফুল ফুটছে সেই সব গাছে।
—আমার এই নতুন জন্মের জন্যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব কী দিয়ে ?
—আমার ইচ্ছের পাপড়িগুলোকে কনকচাঁপা করে দাও।
—সে শক্তিও তো তুমিই দেবে আমাকে।
—এই নাও হৃৎপিণ্ড।
এর পরের ঘটনাটা খুব মজার। প্রাণ পেয়েই
ঘরের দরজা ভেঙে এক ছুটে বেরিয়ে সে গেল পৃথিবীর দিকে।
এখনো ফেরেনি। নিজের
হৃৎপিণ্ড হারিয়ে আমিই এখন গভীর খাদের পাথর।

৩৩

শুনলে হয়তো হাসবি
কিন্তু সত্যি বলছি কোথাও লক্‌লকে আগুন দেখলেই
আজকাল সিনেমা-দেখার মতো উপুড়।
কারণটা বলি।
কিছুদিন আগে কোথায় যেন পড়লাম
স্বদেশী আন্দোলনের দুর্দিনে
নন্দলাল বসু এঁকে দিয়েছিলেন এক গুচ্ছ পোস্টার
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের উত্থানকে
অপরাজেয় করে তুলতে।
কিন্তু পুলিশি হামলার ভয়ে
সে-সব জ্বলন্ত পোস্টার আগুনের পেটে।
খবরটা পড়ার পর থেকেই
আগুনের ভিতরে ক্রোধে বোধে গর্ভবান মানুষের ইস্পাত-মুখ
আগুনের ভিতরে অবিরল শিকল ভাঙার উল্লাস
আগুনের ভিতরে চট্টগ্রামের ঝকঝকে অস্ত্রাগার।
একদিকে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে চলেছে জয়ধ্বনিময় কিশোর
অন্যদিকে নগ্ন সেনাপতির পিছনে
বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর-জ্বালানো হাড়-কঙ্কাল।
এইভাবে কিছুদিন।

তারপর ভুলে যাই সব।
হঠাৎ কদিন আগে আর এক ধাক্কা।
লোরকার সারা জীবনের সনেটগুচ্ছ ভরা ছিল
জনৈক সৈনিক-বন্ধুর পকেটে।
ফ্রাঙ্কোর জল্লাদ-আগুনে
সৈনিক এবং সনেট দুটোই একদিন পুড়ে ছাই।
খবরটা পড়ার পর থেকেই
আগুনের ভিতরে ব্লাডওয়েডিং-এর ছুটন্ত ঘোড়া
ঘোড়ার পিছনে বল্গাহীন কামনার বাঁকা ছুরি
ছুরির পিছনে নীল চাঁদের লাল রক্তের খিদে
আর সবুজ গীটারে কেবলই এক হলুদ বিলাপ।
বিশ্বাস কর অমিতাভ
এখন আগুনের দিকে তাকালেই
দেখতে পাই লোরকার পুড়ে-ছাই সনেটগুচ্ছের
যাবতীয় অক্ষরমালা অর্থাৎ এইসব :
হেভেন, ডেথ, মার্ডার, ব্লাড, উইং,
মাউণ্টেন, লাভ, রক্, ড্যাগার, রুট,
ইউরিন, হেট্, লাফটার, ব্রেস্ট,
লিবার্টি।

৩৪

কদিন কেবল লোরকাকে নিয়েই।
৩০ বছর পরে রাত জেগে
আবার ব্লাড ওয়েডিং।
লোরকার অক্ষরের ভাঁজে ভাঁজে
ঘাতকের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া
একটা চকচকে ছুরির ফলা
আর রক্ত
যা কখনো নিজের
কখনো পৃথিবীর
কখনো সাদা মেঘের দিকে লাফিয়ে ওঠা
গোলাপি জলরাশির অভ্যন্তরে
দাঁতালো জন্তুর বলাৎকারের।
কী ঘটবে সব জানা ছিল যেন
এমন কি কীভাবে ঘটবে
সবুজ আলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ।
লোরকা মানে সেই দুরন্ত ঘোড়া
অগ্নিরশ্মি যার কেশর
আর সময়ের কান্নার ভিতর দিয়ে
ইতিহাসের সূর্যরশ্মির দিকে
যার উল্কা বেগ।
লোরকা মানেই
মৃত্যুর গীটারে জীবনের গান।

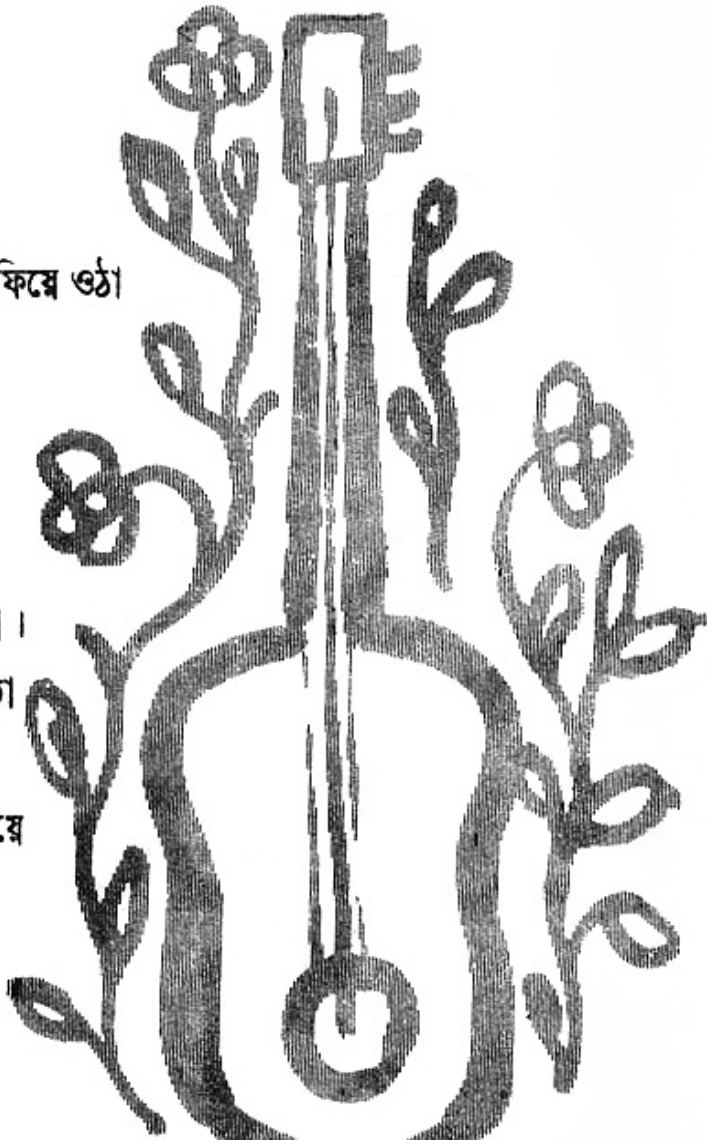

৩৫

স্টেফান জাইগের বালজাক নিশ্চয় তোর পড়া।
না পড়ে থাকলে
মাদাম দ্য বার্নি চ্যাপটারটা এখুনি।
মাদাম তখন ৪৫।
মায়ের বয়সী ঐ মহিলার সঙ্গে
বালক বালজাকের অভ্র-আবীর ভালোবাসাবাসি।
তরুণীদের সম্পর্কে চিরকালই তিনি নিস্পৃহ
তা সে যতই হোক্ না কেন
আগুনে গোলাপ।
যদি পুড়তে হয় তো চুল্লী
মোমের শিখায় তো শুধু অচরিতার্থ ছেঁকা।
আজীবন এই রকমই তাঁর মনোভাব।
জানিয়ে দিয়েছেনও পষ্টাপষ্টি
"দি উওম্যান অফ ফর্টি
উইল ডু এভরিথিং ফর ইউ,
দি উওম্যান অফ টুয়েনটি
নাথিং।"

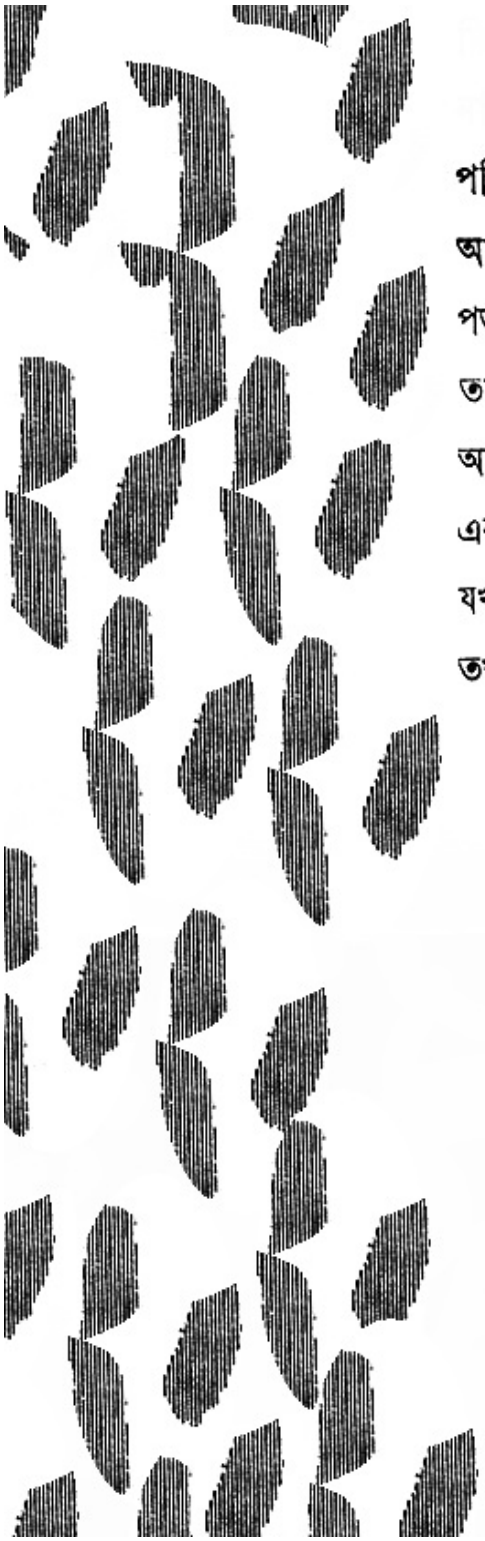

পড়িস, পড়তে পড়তে মনে হবে
আর এক আরব্য-রজনীর উপর উপুড়।
পড়া হলে জানাস
তারপর তোকে একদিন সবিস্তারে—
আমার জীবনেও
এক সোনালী আগুনের কথক।
যখন তার বয়স হুবহু ৪৫
তখন কাক ডাকলে কোকিল শুনি আমি।

দুঃখগুলো পেকে ঝুনো নারকেল হয়েও খসে পড়ে না কেন রে? অথচ সুখের বেলায় ঠিক উল্টোটা। টুসটুসে হওয়ার আগেই অবেলার আঁকশিতে হ্যাঁচকা টান। এখন আমাদের সেই বয়সে পা যখন নুডল্‌স-এর মতো চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে চিরুনীটার প্রত্যেকদিন চাই এক গোছা করে চুল। এমন কি বাতাসেরও ইচ্ছে নয় আমাদের মাথায় দুলুক কোঁকড়া-চুলের দেবদারু। যেভাবে কালো রঙের টাকা, সেই ভাবেই সব কিছুকে লুকিয়ে রাখতে হবে এখন। জানাজানি হলেই রাহাজানি। দেখছিস না দিনের আলোটা পর্যন্ত মাস্তানের চাকু।

অমিতাভ, তোর কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই উড়ে-পুড়ে ভিখেরীর সাত-সিকেয় এসে ঠেকেছে যা। লিখে নে।

১৯-২-৮১ জল এবং গেলাসের প্রথম এক ঝলক দেখা। ৩-৩-৮১ জলের ভিতরে সমুদ্রস্থলভ অগ্নি-চুল্লীর উন্মেষ। ১২-৪-৮১ গেলাসের গায়ে তাপমাত্রার ক্রমবিকাশ। ৮-৫-৮১ গেলাসের প্রার্থনা, জলের উত্তর। ২১-৬-৮১ থেকে ১-২-৮২ পর্যন্ত জল ও গেলাসের আন্তরিক উর্বরতায় হাজার মাইল তৃণভূমির উপরে মেঘমণ্ডলের উপর্যুপরি পুষ্পবৃষ্টি আর অভ্রখনিময় এক নতুন উপনিবেশের সম্ভাবনা। ২৬-৩-৮২ থেকে গেলাসের গায়ে ঈষৎ ফাটল। ১১-৪-৮২ থেকে গেলাসটা, যদি তার ফাটলগুলোকে বলি ঠোঁট, তাহলে আড়াই লক্ষ ঠোঁট নিয়ে গড়িয়ে চলেছে দিকচিহ্নহীন অনন্ত সায়রের দিকে। আর জল জলচৌকিতে পা ছড়িয়ে তাকে ডেকে চলেছে, এই তো আমি, ছুঁচ আর রক্তসুতোয় তোমারই জন্যে বুনে চলেছি শ্বেতমল্লিকার বন।

Kothopokathan by Purnendu Patri

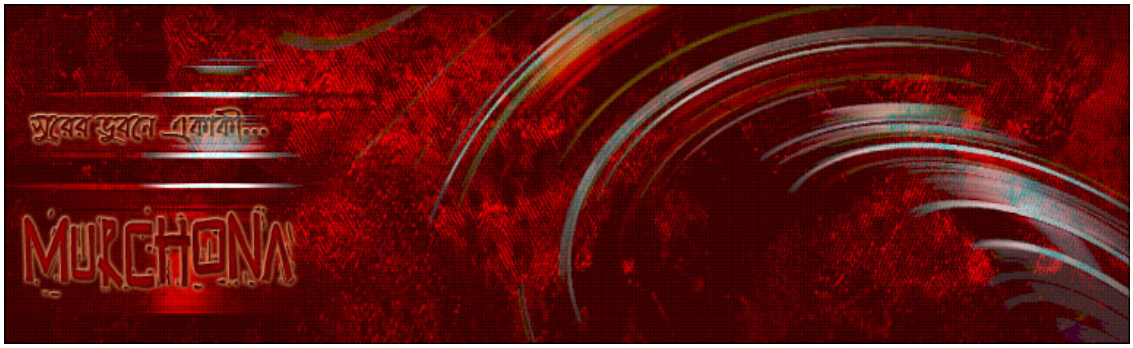

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com